

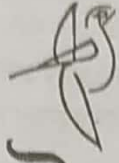


দইয়ল

গানের কাগজ

১

শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও একটি এটলাস ছাত
দেবতোষ গুহ আজো মনে পড়ে মানসী প
প্রসঙ্গ আগমনি গান সঞ্জীব দেবলস্কর শ্রবণ
পেতে রই শাকুর মজিদ তুই ফেলে এসেছিস
নিরে রাখাল রাহা যে গানে জ্ঞানের দুয়ার খে
কাতর প্রেমিকের গান মোস্তাক আহমাদ
বাংলাদেশ সাইম রানা লেখার শক্তি জোগায়
দেখে গান গেও না কাজী আলিম-উজ-জামা
মেহেদী গানের ভিতর দিয়ে পিয়াস মজিদ
ভট্টাচার্য মোহরদি শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত আমি কান পেতে রই লোকগানে
রণেন রায়চৌধুরী শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও একটি এটলাস ছাত
গল্প মৌসুমী ভৌমিক সুর না সংগীত? দেবতোষ গুহ আজো মনে প
মানসী পাল রামকানাইদা তুষার কর প্রসঙ্গ আগমনি গান সঞ্জী
দেবলস্কর শ্রবণ সুকান্ত মজুমদার আমি কান পেতে রই শাকুর মজিদ
ফেলে এসেছিস কারে, মন প্রশান্ত মৃধা গান নিয়ে রাখাল রাহা যে গা
জ্ঞানের দুয়ার খোলে সাইমন জাকারিয়া দগ্ধ-কাতর প্রেমিকের গ
মোস্তাক আহমাদ দীন গণসংগীত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ সাইম রা
লেখার শক্তি জোগায় সংগীত স্বকৃত নোমান খাতা দেখে গান গেও
কাজী আলিম-উজ-জামান শত মুখ তবু একা উজ্জ্বল মেহেদী
কানাইল এমন রঙমহলখানা আজাদুর রহমান গানের রবীন্দ্রনাথ
তপোধীর ভট্টাচার্য মোহরদি শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত আমি কান পেতে রই স্ব
রায় লোকগানের রণেন রায়চৌধুরী শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও এক
এটলাস ছাতার গল্প মৌসুমী ভৌমিক সুর না সংগীত? দেবতোষ গ
আজো মনে পড়ে মানসী পাল রামকানাইদা তুষার কর প্রসঙ্গ আগম
গান সঞ্জীব দেবলস্কর শ্রবণ সুকান্ত মজুমদার আমি কান পেতে র
শাকুর মজিদ তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন প্রশান্ত মৃধা গান নি
রাখাল রাহা যে গানে জ্ঞানের দুয়ার খোলে সাইমন জাকারিয়া দগ্ধ
কাতর প্রেমিকের গান মোস্তাক আহমাদ দীন গণসংগীত : প্রেক্ষাপ
বাংলাদেশ সাইম রানা লেখার শক্তি জোগায় সংগীত স্বকৃত নোমান খা
দেখে গান গেও না কাজী আলিম-উজ-জামান শত মুখ তবু একা উজ্জ
মেহেদী গানের ভিতর দিয়ে পিয়াস মজিদ গানের রবীন্দ্রনাথ
মোহরদি শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত আমি কান পেতে রই স্বপ্না
লোকগানের রণেন রায়চৌধুরী শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও এক



দইয়ল

গা নে র কা গ জ



দইয়াল
গানের কাগজ
প্রথম সংখ্যা
১ কার্তিক ১৪২১ বঙ্গাব্দ
সম্পাদক সুমনকুমার দাশ

ভাইল

১৬ অক্টোবর ২০১৪

৫

প্রকাশক সুমন আহমদ
মুদ্রণ রিমন কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স, জিন্দাবাজার, সিলেট
পরিবেশক বইপত্র, ৯০ রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
৪৩-৪৪ রাজা ম্যানশন, তৃতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট
মোবাইল : +৮৮০১৭১২৮৫৬৩৫৩

প্রচ্ছদ আবু আদনান

৫০ টাকা

Daiol
First Issue
16th October 2014
Edited by Sumankumar Dash
Published by Suman Ahmed
43-44 Raja Mansion, Zindabazar, Sylhet
e-mail : sumankumardash@gmail.com
Tk. 50

দইয়ল

প্রথম সংখ্যা

১ কার্তিক ১৪২১

সূচি

সম্পাদকীয় ৫

গানের রবীন্দ্রনাথ | তপোধীর ভট্টাচার্য ৭

মোহরদি | শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত ২৩

আমি কান পেতে রই | স্বপ্না রায় ২৭

লোকগানের রণেন রায়চৌধুরী | শুভেন্দু ইমাম ৩৮

মনসা মঙ্গল ও একটি এটলাস ছাতার গল্প | মৌসুমী ভৌমিক ৪৬

সুর না সংগীত? | দেবতোষ গুহ ৫৫

আজো মনে পড়ে | মানসী পাল ৫৭

রামকানাইদা | তুষার কর ৬২

প্রসঙ্গ আগমনি গান | সঞ্জীব দেবলস্কর ৬৬

শ্রবণ | সুকান্ত মজুমদার ৭৪

আমি কান পেতে রই | শাকুর মজিদ ৮১

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন | প্রশান্ত মৃধা ৮৬

গান নিয়ে | রাখাল রাহা ৯১

যে গানে জ্ঞানের দুয়ার খোলে | সাইমন জাকারিয়া ৯৪

দন্ধ-কাতর প্রেমিকের গান | মোস্তাক আহমাদ দীন ৯৬

গণসংগীত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ | সাইম রানা ৯৯

লেখার শক্তি জোগায় সংগীত | স্বকৃত নোমান ১০৫

খাতা দেখে গান গেও না | কাজী আলিম-উজ-জামান ১১০

শত মুখ তবু একা | উজ্জ্বল মেহেদী ১১৩

গানের ভিতর দিয়ে | পিয়াস মজিদ ১১৬

কে বানাইল এমন রঙমহলখানা | আজাদুর রহমান ১১৭



মনসা মঙ্গল ও একটি এটলাস ছাতার গল্প মৌসুমী ভৌমিক

আপনারা যে দিন শাল্লা থেকে চলে আসেন, তার পরদিন আকাশ কালো করে মেঘ দেখা দেয়, খুব বৃষ্টি নামে, হাওর উত্তাল হয়ে ওঠে। অন্য এক রূপ নেয় হাওর। ওই রাতে শিশু মিয়াকে নিয়ে শফিক-এর চায়ের দোকানে গানের আসর বসিয়েছিলাম। রাত ১২টায় শেষ হয় আসর। কিন্তু তখনো খুব বৃষ্টি। আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কাক-ভেজা হয়ে বাড়ি ফিরলাম। অনেক দিন পর বৃষ্টি-স্নান করলাম। তখন বার বার মনে পড়ছিল আপনাদের কাজে-না-লাগা ছাতাটার কথা। এই ভর বৃষ্টিতেও সে ছাতাটা কাজে লাগানো গেল না।

ছাতাটা কেনা হয়েছিল বরিশাল জেলার একটা ছোট গঞ্জ-শহরে, নাম আগৈলোঝারা—শহর না বলে বড় গ্রাম বলাই বোধহয় ভালো। শ্রাবণ মাস তখন শেষের দিকে—ছাতা ছাড়া বিশেষ এগোনোই যাচ্ছে না। আমরা যে কেন সঙ্গে করে ছাতা নিয়ে যাইনি, কে জানে? না কি ছোট ফোল্ডিংটা ছিল, সেদিন নিয়ে বেরোতে ভুলে গেছিলাম? মনে পড়ছে না। তবে, বরিশাল শহর থেকে বাসে করে আগৈলোঝারা যাচ্ছি, পথে খুব বৃষ্টি নামলো। এবড়োখেবড়ো পথ, বর্ষায় আরোই ভেঙেভুঙে গেছে। পথে এক জায়গায় বাস কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল; আর নড়তে পারছে না। আরো সব পুরুষ যাত্রীদের সঙ্গে সুকান্ত, আমাদের লোকাল গাইড এবং বন্ধু সুপ্রিয় আর ওর সহকর্মী বিদ্যুৎ—সেদিন যার বাড়িতে আমরা যাচ্ছিলাম মনসামঙ্গল শুনতে—জলকাদায় নেমে খানিক হেঁটে এগিয়ে গেল; বাস অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে চলতে শুরু করার পর ওরা আবার উঠে এলো। আগৈলোঝারায় নামলাম যখন, তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে, কিন্তু সামনেই একটা দোকান ছিল, তাতে নানা জিনিসের সঙ্গে কয়েকটা লম্বা এবং ফোল্ডিং ছাতাও রাখা ছিল, দেখে আমি আর সুকান্ত ভাবলাম বড় দেখে একটা কিনি। আগেকার দিনের মতন কালো কাপড়ের তৈরি, গোল, মেটালের ফ্রেম, হ্যাভেলের মাথাটা প্লাস্টিকের। গায়ে লেখা, ১০০×১০০, এটলাস ছাতা, Special Quality। এই ছাতাগুলো বেশ ওজনদার হয়, হালকা নাইলন-পলিয়েস্টারের গা-ঝারা ভাবটা এতে থাকে না, বরং বৃষ্টিকে শরীরে ধরে রাখে যেন; জল পড়ার শব্দটাও। কেনা তো হলো, কিন্তু তাতে ভালো হলো না মন্দ, বলা মুশ্কিল। কারণ সেই থেকে আর তেমন বৃষ্টি হলোই না, যেমন হলে ছাতা খোলার সুখ হতো। সেই কথাই লিখেছিল সিলেটের সুমন ওর ইমেলে। সেবার আমরা বরিশাল থেকে সিলেটের হাওরে

গেছিলাম, ২০১২ সালের আগস্ট মাসে, পদ্মপুরাণ রেকর্ড করবো বলে।

আমার বাবা-মা উভয়েরই দেশের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে; বাবার পাবনায়, মায়ের বরিশালে। তবু আমি ঠিক কোনো নস্টালজিয়া-কাতর পরিবেশে বড় হইনি। আমার বাবা স্বভাবতই খুব নীরব একজন মানুষ ছিলেন; তাঁর দেশের স্মৃতি বা ব্যথা যা-ই থাকুক, তা তিনি সচরাচর আমাদের বলতেন না, কখনো হয়তো কোনো কথায় তার সামান্য আভাস পাওয়া যেত। ব্যাস, আর কিছু না। বাবা বয়ঃসন্ধিকালে এখান ওখান হয়ে জলপাইগুড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন, সেও প্রাক-পার্টিশন সময়কার কথা। আর আমার মায়েরা তো দাদুর কর্মসূত্রে বাংলার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। ফলে, পার্টিশনের আগে দাদুদের কর্মস্থল এবং দেশের বাড়ি, দুই-ই ছিল; পরে কর্মস্থলই দেশ হয়ে যায়। মায়েরা পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে বড় হয়েছেন, সে-ই ওঁদের দেশ; আমরাও দাদুর বাড়ি বলতে, মামাবাড়ি বলতে, জলপাইগুড়িকেই চিনেছি। তবু গল্প কিছু তো থাকেই—মাঠঘাট, নদী পথ, উৎসব-পরবের গল্প, যা মায়েরা প্রত্যক্ষ না করলেও শুনে শুনে বড় হয়েছেন। আমাদের জীবনেও তার রেশ এসে পৌঁছয়। জলপাইগুড়ির ভাষার নিজস্বতার মধ্যেই সেইসব অন্য ঘরের অন্য স্বর ধরা আছে : খাবা না? কখন আসলা? সেই ধ্বনি আমাদের শ্রবণেও ছায়া ফেলে।

আমার মায়ের বাবার বাড়ি ছিল বরিশালের মহিলারায়, মায়ের মায়ের বাড়ি গৈলায়। সেই গৈলায় মনসামঙ্গল-খ্যাত পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্তর বাড়ি ছিল, ছোট একটা মন্দিরও ছিল। সেই মন্দির ভেঙে যাওয়াতে এখন খানিকটা তারই আদলে, অথচ সম্পূর্ণ শিল্প-নৈপুণ্য-বর্জিত বড় একটা স্টিল-সিমেন্ট-কাচের মন্দির হয়েছে। তাতে বহু বছরের সিঁদুর-লেপা মনসা নামক প্রস্তরখণ্ডটি প্রতিষ্ঠিত। তার সঙ্গে মনসার একটা বিশাল মূর্তিও যোগ হয়েছে। কারণ বিজয় গুপ্ত'র মনসামঙ্গল আজ বরিশালের অন্যতম ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন, সংখ্যালঘুদের জোর দেখাবার জায়গা এবং কর্ম-সংস্থানের সম্ভাবনাও বটে। এখানে সারা বছর মানুষ বেড়াতে আসেন, শ্রাবণ মাসে মেলা বসে, রয়ানি গানের প্রতিযোগিতা হয়, এবং 'সংক্রান্তির দিন দুধ কলা নিয়ে পূজো দিতে আসেন হাজার হাজার নারী, তাদের মধ্যে বোরকা পরা মুসলমান মহিলাও থাকেন (যদিও তাঁরা মন্দিরের ভিতরে যান না/যেতে পারেন না/যেতে চান না; তাঁদের পূজো আর কেউ দিয়ে দেন), কারণ মনসাকে তুষ্ট করা অনেকেরই দায়। তুষ্ট হলে মনসা ভক্তের উপর মঙ্গল বর্ষণ করেন।

দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশে যাই, অথচ প্রথম বার বরিশালে যেতে যেতে ২০১১ হয়ে গেল। ফরিদপুর থেকে বরিশালের বাস মহিলারা পেরোনের সময় টিমটিমে আলোর ভিতরে মায়ের বাবার দেশকে অনুমান করি। সেটা ছিল কালী পূজোর দিন দুয়েক আগের কথা। তারপর তো বরিশালের শ্মশানে দীপাবলীর প্রস্তুতি দেখতে নিয়ে গেল সুপ্রিয়; বললো, একবার এই সময় এসো, আশ্চর্য হয়ে যাবে। কত কত দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষ আপনজনের জন্য বাতি জ্বালাবে বলে ফিরে আসে ঐ দিন। শ্মশানে জীবিত আর মৃতদের ভিড়; গায়ে গায়ে লেগে থাকা সমাধি, বেদি—যেন হিন্দু সম্প্রদায়ের 'All Saints Day'।

সুপ্রিয় সম্প্রদায়ের সুখ দুঃখ আশা আশঙ্কা নিয়ে ভাবে, কিন্তু সে এতটুকুও সাম্প্রদায়িক নয়। সুপ্রিয় শান্তিপূর্ণ সহবাসের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হতে চায়, কিন্তু তার বাস্তব সমস্যা সম্পর্কেও সে ওয়াকিবহাল। আমি মহিলারা-গৈলা বলাতে,

মনসামঙ্গল-বিজয় গুপ্ত বলাতে বলেছিল, তোমরা এসো, আমি লোকজন চিনি, যারা এই গানের কথা জানে। তোমাদের শোনার ব্যবস্থা করে দেবে। সেই সূত্রেই আগৈলঝারায় পূর্ব বাকাল গ্রামে বিদ্যুতের বাড়িতে যাওয়া। ছাতা কেনার পিছনে এতখানি ইতিহাসও জুড়ে যায়।

মরণ-জিয়ন

আমরা যাবো বলে সেদিন বাড়ির আর পাড়ার মেয়েরা লখিন্দরের মরণ-জিয়ন এক নাগাড়ে পড়লেন, সেই অধ্যায়কে এই গল্পের ক্লাইম্যাক্স বলে তাঁরা মানেন, ফলে তা দিয়েই অতিথিদের আপ্যায়ন হলো। মৌখিকতার সংস্কৃতিতে এইভাবে গল্পে গল্পে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সমাজ সংগঠিত হয় আর এই সবার তলে যে ধারা বহমান, তা হলো মানুষের বিশ্বাস। আমার মায়ের ঠাকুমার সমস্ত জীবন বিশ্বাস দিয়ে গড়া ছিল, তিনি তাঁর বিজয় গুপ্ত'র পুথিটি সযত্নে খুলতেন, পড়তেন, ভাঁজ করে রেখে দিতেন। তাঁর একটিই ছেলে, সে লেখাপড়া শিখে মাস্টারি করে, নাতনিরা স্কুল কলেজ যায়, তবু বচনে, শ্রবণে তিনি তাঁর বিশ্বাসের ভাগ দিয়ে যান তাদের; আমার মায়ের থেকে শোনা দু-এক কলি সুর আমার কাছেও এসে পৌঁছয়। এবার সেই সুরের সঙ্গে আগৈলঝারার সুর মিশে যেতে শুরু করে। মরণ-জিয়নের পর মেয়েরা মঙ্গল গান করেন, যে গানে ঘরের মানুষদের মঙ্গলকামনা করা হয়। 'ও কি জিলো, জিলো লখিন্দর, সর্বাঙ্গ সুন্দর, খঙিল পদ্মার বাধ।' পরের লাইনে ঘরের ছেলেদের নাম করা হয়, 'আবার চিত্তদার কল্যাণে এই দংশন জিয়াইলাম রে, খঙিল পদ্মার বাধ।' 'বিদ্যুতের কল্যাণে এই দংশন জিয়াইলাম রে...আবার গৌরান্দর, আশুদার, ভবদার, বিমলদার কল্যাণে...'। ছেলেদের নাম আলাদা করে, আর বাকি যারা, অর্থাৎ ঘরের মেয়ে বউরা, তারা ওই 'সবার কল্যাণে এই দংশন জিয়াইলাম রে' লাইনে ধরা থাকে।

মৌখিকতার ধারা বা অর্যালিটি বেয়ে যেটুকু সুর আমার কাছে এসেছিল মায়ের ঠাকুমার কাছ থেকে, তাকে আমি দূরে রেখে দেখি। পর্যবেক্ষণ করি যেন। মন তাতে জড়িয়ে যায় ঠিকই, এই ধারাবাহিকতার মধ্যে আমারও সামান্য অস্তিত্ব থাকতে পারে যে, সেই কথা ভেবে একধরনের প্রাপ্তির বোধ হয়। তবু মায়ের ঠাকুমার বিশ্বাসকে তো আমি আর অত সহজে গ্রহণ করতে পারি না। অমন নিঃসংশয় মন পাবো কোথায়? আরো প্রশ্ন জাগে : ঠাকুমার মনেও কখনো প্রশ্ন জাগত না, এমনটাই বা আমি ধরে নিচ্ছি কেন? ঠাকুমার নাতনিরা স্কুল ফেরত দায়সারাভাবে পাঁচালি পড়েই ছুট দিত খেলায়, ঠাকুমাকে প্রশ্ন করে জ্বালাতন করতো—কেন? ছেলেরা বেশি পাবে কেন? আমরা কেন কম? 'বন্দিলাম বন্দিলাম মা গো যত্নে দিয়া ঘা'—এই সুরের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও আমাদের উত্তরাধিকার। সেই প্রশ্নের সঙ্গে তারপর আমার নিজস্ব সময়ের প্রশ্ন যুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে মা-দের প্রশ্ন যতটা নিঃসংশয় ছিল, আমার প্রশ্ন তেমনও থাকতে পারে না আর। জটিলতর রূপ নেয়। আমার যেমন মনে হয়, মনসামঙ্গল জুড়ে মেয়েদের গল্প, সেই মেয়েরা তো কত ধরনের, কী সব আশ্চর্য ক্ষমতা তাদের! তার শুধুই নিজেদের নিবেদন করে দিতে চায়, এমন তো না। বেহুলা, মনসা, সনকা—কতভাবেই তো অর্থ করা যায় এই গল্পের। মনসামঙ্গলের পুরুষরাও যে সবাই দুরন্ত প্রতাপশালী, তেমনও তো না? শঙ্কু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের ৪৮ দইয়ল

পালা'-য় শেষে চাঁদ ভাঙাচোরা একটা মানুষ হয়ে যায়। কেন হয়? কেমন করে হয়? এই গল্পই তো সেই ইন্টারপ্রিটেশনের সুযোগ করে দিচ্ছে। আসলে, এইসব যুগ যুগ ধরে প্রাণ পাওয়া গান-গল্পের মাহাত্ম্যই এই বহুমুখীনতায়, এর কোনো সরল ব্যাখ্যা হয় না।

আমাদের শ্রাবণ মাসে মনসামঙ্গলের গানগল্পের সঙ্গে আরো অনেক গল্পের সুতো জড়িয়ে যায়। বলা গল্প, শোনা গল্প, কত রকম চলার গল্প। ২০১২-র আগস্ট মাসে বৃষ্টি একটু কমই হয়েছিল। ফরিদপুরে শমুনাথের চায়ের দোকানে বসে সালামতভাই ভূতের গল্প বলছিলেন, সন্ধ্যাবেলায় ইলিশ কিনে বাড়ি ফেরার পথে তেনাদের সঙ্গে দেখা হবার গল্প। বাড়ির বড় বউ বা সবচেয়ে ছোট বউ মাছ ভাজছে, ভেজে ভেজে রাখছে, ওদিক থেকে মাছ ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। কে নিচ্ছে, কে খাচ্ছে? বেড়ালের রূপ ধরে আসছেন হয়তো তিনি। যে বউ আবার খুব চালাক, সে উনুন থেকে ছাই ছুঁড়ে মারবে, তখন তিনি মরে যাবেন, এবং পরদিন দেখা যাবে উঠোনে একটা মরা কাক। তার থেকেই বোঝা যাবে যে উনি এসেছিলেন। আর একজন আছে, তার মনে খুব দুঃখ, সে শুধু উঁহুঁ উঁহুঁ করে করে কাঁদে। খুব লম্বা, সাদা কাপড় পরে আর তাল গাছে থাকে। এইসব গল্প বলতে বলতেই সালামতভাই বলেন, 'শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হবে, কাঁঠালের বিচি ভাজা, চালভাজা খাওয়া হবে, হয়তো বা ছোলাও, আর হাট থেকে ইলিশ এলে ইলিশ। তখনই না এই গল্প জমে!' সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও চলে পাশাপাশি। ওই ইলিশ মাছ ভ্যানিশ হবার ব্যাখ্যা করে সালামতভাই বলেন, 'বাড়ির বউটা তো দিয়ে থুয়ে নিজের ভাগে বিশেষ পায় না, তাই হয়তো দু-চার পিস...।' মাছ থেকে সাপ, সাপ থেকে মনসা, মনসা থেকে হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-মুসলমান থেকে সন্ধ্যা আহ্নিক আর মাগরিবের নামাজ—মনসার পাঁচালির মতনই আমাদের পাঁচালির গল্পও যে কত দিকে চলে চলে যায়!

মৌখিকতার ভিতরে বাস

এও এক মৌখিকতার ভিতরে বাস। এই যে মুখে মুখে গল্প, কথা, গান; এই যে ধ্বনির জগৎ, একে ঠিক লিখে বোঝানো যায় না হয়তো। পরে যখন রেকর্ডিং শুনে লেখার চেষ্টা করি, সবটা লিখে উঠতে পারি না। আর সব কিছু তো রেকর্ড করা হয়ও না। শাল্লায় শফিকের চায়ের দোকানের এমন একটা পরিবেশ ছিল, যাকে *ambience* বলে, তার গল্প হয়তো আর কোনো শ্রাবণ-সন্ধ্যায় মুড়ি ছোলা ভাজা খেতে খেতে করা যাবে। দেয়ালবিহীন যাত্রীছাউনির পাশ দিয়ে ঘটঘট করতে করতে মোটর বোটের যাওয়া আসা, লিংকনের গান, সুমনের গল্প, ছোট্ট সোহেলের আমাদের পাশে ঘুরঘুর, কোথা থেকে এক শিশু মিয়ার আবির্ভাব—গল্পের পিছনে গল্প, তার পিছনে আরো গল্প। লিংকন আর শিশু মিয়া দুজনেই শফিকের চায়ের দোকানে বসে করিম শাহ'র গান গেয়েছিল। লিংকন যে গান গায় সেই কথা আমরা আগের দিন শুনেছিলাম। তখনো শাল্লা সদরের ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, এক পা যাই আর গ্রামের নাম পাল্টে যায়—ভাবছি এলাম শাল্লায়, হয়ে গেল ঘুঙ্গিয়ারগাঁও বাজার, সেখানে আমাদের গেস্ট হাউস আর শফিকের এই চায়ের দোকানটি। একটু এ-গলি সে-গলি ঘুরতেই পৌঁছে গেলাম ডুমরায় যেখানে লিংকনদের, তারপর সুমনদের বাড়ি। এখানে

অন্য পাড়া আসলে অন্য গ্রাম হয়ে যায়, এইরকমটা মনে হচ্ছিল। সবই দশ মিনিট হাঁটা পথের মধ্যে। সে যাই হোক, সেই দিন আমরা সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থেকে মিলনবাজার হয়ে শাল্লা সদরে এসেছি। বিকেলে পদ্মপুরাণ পাঠ শুনতে ক্ষিতীশবাবুর বাড়িতে নিয়ে গেল সুমন, ক্ষিতীশবাবুর বড় ছেলেই লিংকন, সে এখন সিলেট শহরে থেকে কলেজে পড়ে আর শুভেন্দু ইমামের 'বইপত্র'-তে কাজ করে।

সেই বছর পদ্মপুরাণের মাস রমজানের মাসও ছিল। পদ্মপুরাণের সুর সেই প্রথম কানে ধরা দিল, তা বরিশালের সুরের থেকে একেবারেই আলাদা। তেমনই অবশ্য হবার কথা। কিন্তু আমি এখানে মনসার গল্পের বাইরে একটা অন্য গল্প বলতে চাই।

রমজানের মাস, বিকেল হলে ইফতারির পেঁয়াজি, বেগুনি, জিলিপির গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে। লিংকনদের বাড়ি যাবার আগে সুমনকে বললাম, একটু কিছু কিনে নিয়ে যাই আমরা, একটু মিষ্টিটিষ্টি। সুমন বললো, এখানে ওসব কোথায় পাবেন? তারপর লিংকনদের ঘরের খাটের ওপর বসে চা জিলিপি বিস্কুট খাওয়া হলো। আমি আবার সুমনকে বললাম, কিছু একটা নিয়ে এসো না—সব কিছুরই তো একটা রীতি আছে! সুমন আমার অনুরোধ রাখতে আমাদের থেকে টাকা নিয়ে একটা ছেলেকে দোকানে পাঠাল। সে আবার ঠোঙা ভরে গরম জিলিপি নিয়ে এলো। তখন আমার খেয়াল হলো, একদিকে পদ্মপুরাণ পড়া হচ্ছে, আর সেই আসরে বসে আমরা সবাই ইফতারি খাচ্ছি—এর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই, কোনো আরোপ নেই, কারণ এমনটাই হবার কথা। সিলেটের এক জলে-ঘেরা প্রত্যন্ত গ্রামে এই সহাবস্থানের জন্য কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম, সেকুলারিজম-এর বাণী—এসব কোনো কিছুরই কিন্তু দরকার পড়ে না। একই সঙ্গে, এই সহাবস্থানের অর্থ কিন্তু এটা নয় যে এখানে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব বা অবিশ্বাস নেই। সম্ভবত এই দ্বন্দ্বমূলক সহাবস্থানের কথাই শাহ আবদুল করিম লিখেছিলেন তাঁর গানে, যা পরে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মহল নিজের মতন করে ব্যাখ্যা করে, আপন করে নিয়েছে।

তো, এই যে লিংকন, যার বাড়িতে জিলিপি খাওয়া হলো সবাই মিলে, সুমন বললো যে ও খুব সুন্দর গান গায়। কত আর বয়স হবে? এই আঠারো কুড়ি হয়তো বা। আমরা গ্রামে যাচ্ছি বলে লিংকন বাড়িতে এসেছে; এক তো মনসা পূজা, তায় আবার ঈদের ছুটিও চলছে। বোঝা গেল সুমনের দিকে তাকিয়ে আছেন ওর বাবা মা। সুমন সিলেটে-ঢাকায় পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত; ও গাইড করলে ছেলে হয়তো একটা দিশা পাবে। পরদিন শফিকের চায়ের দোকানে লিংকন গান শোনালো। সত্যিই ছেলেটার গলা আর গায়ন, দুইই খুব মধুর। করিম শাহ'র 'কেন পিরিতি বাড়াইলা রে বন্ধু ছেড়ে যাইবায় যদি', ভগিতাবিহীন উকিল মুনশির 'সুয়াচান পাখি, আমি ডাকিতেছি তুমি ঘুমাইছ নাকি?'—এইসব গাইলো লিংকন। ভগিতা গাইলে না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম। সুমন বললো, ভগিতাটা দেইখ্যা লইয়ো। লিংকনের খুবই নম্র স্বভাব, সে বাধ্য ছেলের মতন বললো, দেখে নেবো। তারপর আমতা আমতা করে বললো, 'আমি আসলে ভগিতাটা পাই নাই। বারী সিদ্দিকী তো ভগিতা গান নাই।' লিংকনের গান নিয়ে আমরা পরে অনেক কথা বলেছি। লিংকন বড় হয়েছে হাওরে, এই জল বাতাস ওর রক্তে, অথচ ওর গায়ন, উচ্চারণে ওর অঞ্চলের ছাপ বড় একটা নেই। সুকান্ত বলছিল, লিংকনের গলা থেকে ওর অঞ্চল মুছে গেছে। ঠিকই। লিংকনের পছন্দ বলিউডের সোনু নিগমের গান। ও হয়তো স্বপ্ন দেখে সেই ২০০৫-এর ৫০ দইয়ল

বাংলাদেশের ক্লোজ-আপ ওয়ানের আইডল, জামালপুরের নোলকের মতন ওর-ও একদিন নামডাক হবে। বস্তুত, এই বারী সিদ্দিকী যেন এই একটা নতুন প্রজন্মের শিক্ষক হয়ে গেলেন। নোলককে আমি ইন্টারভিউ-এ বলতে শুনছি, আমি শ্রদ্ধেয় বারী সিদ্দিকীর সুয়াচান পাখি গানটা গাইলাম ক্লোজ-আপে।

New Orality?

এই যে শুনে শুনেই শেখা, কিন্তু শোনার মাধ্যমটা পাল্টে যাচ্ছে, একে কোনো নতুন মৌখিকতার ধারা বলে চিহ্নিত করা যায় কি? A New Orality? মজা হচ্ছে যে, এই শোনার মাধ্যম কিন্তু শুধু এমন জায়গায় পাল্টাচ্ছে না যেখানে ট্র্যাডিশনাল মৌখিকতার ধারার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। শাল্লার মতন জায়গায়, এমনকি সিলেট শহরেও পুরনো ধারা এখনো বহমান। এবং সেই সঙ্গেও লিংকনদের জীবন জড়িয়ে আছে। অথচ এই রেকর্ডিং শুনে গান শেখা, গান 'দেখে' (কারণ বেশির ভাগ গানেরই মিউজিক ভিডিও পাওয়া যায় এখন) গান শেখা, এর সঙ্গে যেন অনেক সহজে কানেক্ট করতে পারছে লিংকনরা। এবং এর প্রভাব শুধুমাত্র গাওয়ায় পড়ছে না, গানের ইন্টারপ্রিটেশনেও পড়ছে। কারণ মৌখিকতার ধারায় গুরুর বাণী, গুরুর ভাব খুব জরুরি একটা বিষয়। Youtube-এ বারী সিদ্দিকীর 'সুয়া চান পাখি'র মিউজিক ভিডিওটি যিনি দেখেছেন, তিনি আমার কথার মানে সহজেই বুঝতে পারবেন। বারী সিদ্দিকী যেখানে এক বাংলা সিনেমার নায়কসম। তাঁর 'সুয়া চান পাখি'টি আক্ষরিক অর্থেই চিরঘুমে শায়িত। এই গানের গল্পে নায়ক ছুটে আসছে আর নায়িকার নাকে তুলো গৌঁজা লাশ পড়ে আছে বাড়ির দাওয়ায়, এবং কিছু সত্যিকারের দরিদ্র গ্রামবাসী তাকে ঘিরে বসে আছে। Cut to বারী সিদ্দিকীর প্রাণপণ হাত পা নেড়ে কেঁদে কেঁদে এই গান গাওয়া, সেখান থেকে নায়ক নায়িকার প্রেম, আবার বারী সিদ্দিকী, তারপরই নায়কের কাঁদতে কাঁদতে লাশের কপালে চুমু খাওয়ার দৃশ্য, ব্যাকগ্রাউন্ডে বারী সিদ্দিকীর কান্না-ভেজা গান ইত্যাদি ইত্যাদি। লিংকন কিন্তু ঠিক ওইভাবেই ভাসিয়ে ভাসিয়ে গানটা গায়, যেমন নোলকও গেয়েছিল। সে গুণী এবং নিষ্ঠাবান, তাই তার গাওয়ায় কোনো খাদ থাকে না। 'গুরু'র কাছে যা শিখেছে, তা-ই সে যত্ন করে গায়। আসলে গুরু এখানে কোনো বিশেষ শিল্পী নন, গুরু এখানে মিডিয়া। গুরু Youtube। আর আসর বসেছে মুঠোর ফোনে বা ঘরের টিভিতে অথবা কোলের কম্পিউটারে। সেই আসরের শিষ্য/শ্রোতা একাধারে বর্তমান এবং অলীক; real and virtual.

সেদিনের গানের আসরে আর একজন ভারি গলায় করিম শাহ'র 'গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান, মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি [ঘাটুগান] গাইতাম/আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা'—এই গানটি গাইলেন আর নাম বললেন কালীপদ রায়। এই গানটি তো এই অঞ্চলের জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে—আমাদের রেকর্ডিং-এ কতজনের গলায় যে এই গানটি ধরা আছে! কালীপদর বাড়ি বললেন শাল্লাতেই। এদিকে একজন উশখুশ করছে, সে গান গাইতে চায়, তার নাম শিশু মিয়া (আপনি করে লিখছি না কারণ শিশু মিয়া নামটার সঙ্গে কী জানি কেন আপনি সম্বোধনটা কিছুতেই যাচ্ছে না)। সে কেবল বলছে : 'আমি একটা গান কইয়া লই'। সুমন তাকে বললো, 'গাও শিশু মিয়া গাও'। সুমন তাকে আগে থেকে চিনতো না অবশ্য। তারপর

সে যখন গাইলো, ‘মন রে তুমি কুপথে যাইয়ো না’, তখন তাকে আর জিজ্ঞাস করতে হলো না যে, তোমার বাড়ি কোথায়? তার গায়নেই তার ঘর রচিত হয়ে গেছিল। এইভাবেই তো ২০০৪-এ আবদুল হামিদ আরকুম শাহ’র ‘ছাড়িয়া যাইয়ো না বন্ধু রে’ গেয়েছিলেন। গলার texture, tone, গান ধরা ছড়া, ঐ একই রকম (আবদুল হামিদের বাড়ি যদিও ছিল বগুড়ায়, তবু এই দীর্ঘ দিনের সিলেটবাস তাঁকে একান্তই আঞ্চলিক করে দিয়েছে)। অথবা ২০০৬-এ বিরহী কালা মিয়ার গান যেমন ছিল। শিশু মিয়া মনে হয় natural Singer, তার চারপাশে যে গান ঘুরে বেড়ায়, সেই গানকেই সে সহজে ধরে ফেলে। আমাদের জন্য মাত্র দুটো গানই গেয়েছিল সে, পরে যেদিন সুমন শফিকের দোকানে ‘আসর বসিয়েছিল’, যার কথা সে আমাকে ইমেলে লিখেছিল, সেই বৃষ্টির দিনটিতে শিশু মিয়া নিশ্চয় আরো অনেক গান গেয়েছিল।

আর্ট ও আর্টিস্ট

শিশু মিয়া natural Singer, সাধুশ্রীর ধরণীও তাই। লিংকনও তাই। কিন্তু ধরণীর ব্যাপারটা একটু আলাদা মনে হয় আমার। ধরণী আর্টিস্ট। এখন, ধরণী যদি আর্টিস্ট হয়, লিংকন বা শিশু মিয়া নয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তর আসলে আমার জানা নেই ঠিক। এ আমার মনে হওয়ার কথা আমি লিখলাম। কী জানি? আর্টিস্টের মধ্যে যে নিমজ্জিত এবং একলা ভাবটি থাকে, আর্টের গহীনে তার যে স্থান সে রচনা করে—তাকে ঠিক শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে জানি না আমি। আমি যতটুকু বুঝেছি, তেমন ভাব খুব বেশি মানুষের থাকে না। (এ নিয়ে কেউ তর্ক করলে আমি আগে থেকেই হাত তুলে হার স্বীকার করে নেবো)। ধরণী আমাদের সঙ্গে শাল্লায় দেখা করতে এসেছিল এবং শ্রাবণ সংক্রান্তির আগের রাতে, যখন সমগ্র হাওর থেকে পদ্মপুরাণের সুর ভেসে আসছিল, সেই রাতে ধরণী রাধারমণের গান গেয়েছিল সুমনদের বাড়ির ছাদে বসে। ওরকম গান সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। অঞ্চল তো আছেই তার কণ্ঠে, কিন্তু সৃজনশীলতা এবং সংবেদনশীলতায় ধরণী কমিউনিটিকে অতিক্রম করে, মৌখিকতার সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে, একলা তার নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় যেন; এবং তখনই হয়তো সে একজন আর্টিস্ট-এ পরিণত হয়।

ধরণী মুখচোরা, একলা। তার মধ্যে একটা দুঃখী দুঃখী ভাব। তার বাড়ি শাল্লার সাধুশ্রী গ্রামে, ঐ গ্রামেই তার সঙ্গে আমাদের ২০০৮-এ প্রথম দেখা হয়েছিল, এবং আবার সে চার বছর বাদে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বলে হাওরের জল পেরিয়ে শাল্লায় এসেছে। মাঝে একবার সিলেট শহরে আমাদের সামান্য একটু দেখা হয়েছিল যদিও, এবং সেবার ধরণী বলেছিল, দিদিমণি, আপনার সঙ্গে আমার একটা ছবি—শেষ পর্যন্ত সেই ছবিটি তোলা হয়নি যে, এই এখন লিখতে লিখতে আমার কথাটা মনে পড়লো। যাই হোক, ২০০৮-এর মার্চ মাসে একদিন, গ্রামের বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিল্পী বিমল দাসের নেতৃত্বে, সারা রাত ধরে গান হয়েছিল সাধুশ্রীতে। ঐ হিন্দু প্রধান গ্রামের প্রায় সব পুরুষ সেই গানে যোগ দিয়েছিলেন। তিননাথের গান, হোরি বা হোলি গান, কীর্তন—সেই রাতে অদ্ভুত এক এনার্জি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সে তো শুধু গান নয়, কোরিওগ্রাফিও বটে। সেদিন গাইতে গাইতে ভোর হয়ে গিয়েছিল এবং আসর শেষ হয়েছিল প্রভাতী দিয়ে। ধরণীকে চিনতেন আমাদের বন্ধু অম্বরীষদা, ওঁর ৫২ দইয়ল

ব্যাংকে কোনো একটা কাজে গিয়েছিল সে একদিন, সেই থেকেই আলাপ। সেই রাতে আমরা ধরণীর বাড়িতে সবাই ভাত খেয়েছিলাম আর তারপর মন্দিরের চাতালে যে গানের আসর বসেছিল, ধরণীর বাবা দীপচরণ দাস তাতে অপূর্ব খোল বাজিয়েছিলেন। সেই আসরে ধরণী অত্যন্ত মৃদুভাবে একটা গান গেয়ে নিজের সামান্য পরিচয় রেখেছিল। কিন্তু ধরণী ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। ফলে, শ্রাবণ-শেষের সেই রাতের ছাদই তার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল। ‘সুবল বলো বলো বলো চাই, কেমন আছে কমলিনী রাই?’ এমনতেই দুঃখী একটা মানুষ, তায় রাতের অন্ধকার, রাতভোর গান গাইবে মেয়েরা, গ্রামে গ্রামে ‘উৎসব-মুখরতা’, একই সঙ্গে মনসার আসন্ন বিদায়, আমাদের ঘরে ফিরে আসা—সেই রাতে গানের ভিতরের ব্যথা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে যে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

কেবল ভাবছি তোমাকে চিঠি লিখব, কিন্তু হয়ে উঠছে না কিছুতেই। শাল্লার রেকর্ডিং শুনি, তোমাদের দ্বীপের মতন গ্রামের ছবি দেখি, ডুমরার সুভাষ, যিনি নাকি যে কোনো যন্ত্র খুলে সারিয়ে ফেলতে পারেন, তাঁর কণ্ঠস্বর আমাদের মজিয়ে রাখে। কৃষ্ণকান্তবাবুকে মনে পড়ে, তোমাদের বাড়ির ছাদে রাতের গান, ধরণীর গলায় বিচ্ছেদ উপচে পড়ে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ভেসে আসা পাঁচালি, মুঠোভরা নারকেল প্রসাদ, নৌকার ওপর লিংকনের বাবার মনসার প্রতিমাকে দু-হাত দিয়ে আগলে দাঁড়িয়ে থাকা, তোমার দীপুর সুকান্তর প্রশান্তর ঝাপ করে জলে ঝাঁপ দেওয়া—এমন একটা ছুটি সহজে মেলে না। এইসব ভাবি কিন্তু চিঠি লিখতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়।

আজ ছবি দেখছিলাম আর সুষমা মাসিমার রেকর্ডিং শুনছিলাম। কী যে সুন্দর! লিংকন কেমন আছে?

বিসর্জনের দিন নানা দিক থেকে আসা নৌকো থেকে সবাই যখন মনসাকে নিয়ে হাওরে ঝাঁপ দিল, তখন আমাদের নৌকো থেকে একে একে সুমন, সুমনের বন্ধু দীপু, লিংকন, প্রশান্ত, মাইক-রেকর্ডার ফেলে রেখে সুকান্ত—ওরাও সব লাফিয়ে জলে নেমে পড়ল। ধরণী নামলো না অবশ্য। বিসর্জনের পর আমাদের নৌকাতে অম্বরীষদা, তুষারদা, প্রশান্ত, ধরণী আর আমরা দু’জন রয়ে গেলাম; সুমন, দীপু, লিংকনরা বিসর্জনের নৌকোয় চেপে ঘরের দিকে ফিরে গেল। আমার তখন দারুণ মন খারাপ হচ্ছে, মুঠোয় ধরা ফোনে সুমনকে লিখলাম, তোমরা চলে যাবে যে বুঝতেই তো পারিনি। উত্তরে সুমন আমাদের ‘উৎসব-মুখর বিদায়’-এর কথা লিখলো আর ওর শব্দবন্ধটি আমায় খুব নাড়া দিল—দারুণ expression তো ‘উৎসব-মুখর বিদায়’! মেলা-শেষে ধূলট যেমন। Celebration of the end because in it is embedded the seed of another beginning.

পুনশ্চ

ঈদের দিন আমরা কুশিয়ারা পেরিয়ে ওপারের জকিগঞ্জ থেকে এপারের করিমগঞ্জে এলাম। সেদিন বর্ডারে একটি মাত্র লোক, সে ধর্মে হিন্দু, তাই তাকে সেদিনকার ডিউটি দেওয়া হয়েছে। একটা সরু একফালি নদী, তাতে ততোধিক সরু একটা নৌকা। এতেই দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া। এদিকে পৌছনর পর উৎসবের আলো

যেন দপ করে নিভে গেল। এই ক'দিন মনসা ছিল, রমজান ছিল, ইফতারি ছিল, মুঠোভরা নারকেল প্রসাদ ছিল—গান ছিল, গল্প ছিল, গল্পের উপকরণ ছিল কত। আমাদের মতন কমিউনিটিবিহীন মানুষের জন্যেও কমিউনিটির জাল বিছানো ছিল যেন। এদিকে যাত্রা পথেই কখন আবার আঁগেলঝারার ছাতাটা গেছিল একটু বেঁকে। তারপর একদিন আমাদের কলকাতার গলিতে 'ছাতা সারাই, পুরনো ছাতা সারাই' হেঁকে হেঁকে ফিরিওয়ালা এলো। আমি চারতলা থেকে নেমে গিয়ে ছাতা সারিয়ে আনলাম। আশা করি পরের শ্রাবণে কাজে লেগে যাবে।

...

নোট

উদ্ধৃত ইমেল দুটি সুমন আর মৌসুমীর পরস্পরকে লেখা, ৫/৯/২০১২ তারিখে।

এছাড়া, এই লেখায় যাঁদের নাম উল্লেখ আছে, তাঁদের পরিচিতি নিচে দেওয়া হলো; লেখায় যেভাবে পরপর তাঁরা এসেছেন, সেই অর্ডারে :

সুপ্রিয় দত্ত, বরিশাল। 'নাগরিক উদ্যোগ' NGO-র কর্মী।

বিদ্যুৎ কুমার দাস, বরিশাল। 'নাগরিক উদ্যোগ' NGO-র কর্মী।

সুকান্ত মজুমদার, কলকাতা। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, দ্যা ট্র্যাভেলিং আর্কাইভ
(www.thetravellingarchive.org)।

সালামত খান, ফরিদপুর। সাংবাদিক।

সুমনকুমার দাশ, সিলেট। লেখক, সাংবাদিক, গবেষক।

সোহেল, শাল্লা, সুনামগঞ্জ। বয়স ১০-১২ হবে, বাজারে একটা দোকানে কাজ করে।

শুভেন্দু ইমাম, ওরফে হান্নানভাই, সিলেট। লেখক, 'বইপত্র'-এর কর্ণধার।

বারী সিদ্দিকী, ঢাকা। বাঁশি বাজান এবং গান করেন।

অম্বরীষ দত্ত, সিলেট। ব্যাংকে চাকরি করেন; একসময়ের নাট্যকর্মী।

দীপু, শাল্লা, সুনামগঞ্জ। রাজনৈতিক কর্মী।

প্রশান্ত মৃধা, সিলেট। লেখক ও অধ্যাপক।

সুষমা দাশ, সিলেট। সংগীতশিল্পী।

তুষার কর, সিলেট। কবি।

...

কলকাতা, ৩/৬/২০১৪

লেখক : প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী, গবেষক ও লোকগানের সংগ্রাহক।